পরিস্থিতির তীব্রতা.....

মুস্তফা মুহসিন

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়টাতে মানবজাতির ওপর গাঢ় অন্ধকারের মতো জেকে বসেছিল রোমান, পারসীয় আর আরব "সভ্যতা"র প্রভাবে কায়েম হওয়া জাহেলিয়াত আর জুলুম। অত:পর এর অবসান ঘটায় ইসলাম। সপ্তম শতাব্দীর শেষ নাগাদ ইসলামী কর্তৃত্ব দুনিয়াতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নজির ইতিহাসে এর আগে বা পরে আসেনি। জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে হঠাৎ জেগে ওঠে পৃথিবীবাসী প্রত্যক্ষ করে, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী, শক্তিশালী ও সুবিস্তৃত সভ্যতাকে। তারপর সুদীর্ঘ ১২০০ বছর মানবজাতির নের্তৃত্ব দিয়েছে ইসলামী জাতি।

রাসুলুল্লাহ ? এর ২৩ বছরের বৈচিত্র্যময়, সংগ্রামী নবুওয়াতী জীবনের পথচলা থেকে এমন এক জীবনব্যাবস্থা পাওয়া যায়, যার মাঝে প্রকাশিত হয়েছে প্রত্যেক জাতি ও প্রজন্মের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ, সম্মান ও কর্তৃত্বের রূপরেখা। ইসলামী সভ্যতা ব্যাক্তি মানুষকে দিয়েছে উন্নত চরিত্র, সমাজকে করেছে সুসভ্য, মার্জিত, শৃঙ্খলিত ও পরোপকারী।

ইসলামী সভ্যতার উত্থান ও ব্যপক বিস্তৃতি ঘটে মাত্র অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামের এই বিস্ফোরণ, তথা 'পশ্চাৎপদ' মরুর যাযাবরদের হাতে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের এই পরাজয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেয়া প্রায় অসম্ভব। বাস্তবতা হলো, প্রবল পরাক্রমশালী পরাশক্তিগুলো আরব বেদুইনদের হাতে পরাজিত হয়নি, তারা অবনত হয়েছিল বিশুদ্ধ আকিদা ও নববী মানহাজের অনুসারীদের কাছে। ইসলামের এই উত্থান আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত চিরন্তন নিয়মনীতি মেনেই হয়েছিল। কারণ কল্যাণ ও উন্নতির সর্বজনীন মূলনীতি শরঈ মূলনীতির অনুগামীই হয়ে থাকে। এ মূলনীতিগুলো যারাই মেনে চলবে- তারাই আত্মিক, জাগতিক, পারলৌকিক উন্নতি অর্জন করবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতা টিকে রইলো, তারপর উম্মাহ ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হলো অধঃপতনের দিকে। প্রাচুর্যের ফিতনায় বিস্মৃত ও উদাসীন হলো নিজ আমানত আর দায়িত্বের ব্যাপারে। পেটপূজা, নারীসঙ্গ আর ক্ষমতা-পদমর্যাদার সাময়িক সুখের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে গেলো উম্মাহর নের্তৃস্থানীয়রা। চাপা পড়ে গেল দুনিয়াতে মহান আল্লাহর কালেমাকে সুউচ্চ করা এবং মানবজাতির হেদায়াতের মহান উদ্দেশ্যগুলো।

ইসলামী জাতির ইতিহাসে প্রায়ই এমন হয়েছে যে, মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ বাহ্যত মুসলিম হলেও, চাল-চলনে কাফেরদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে তাদের অনুসরণ করেছে। কিন্তু, আল্লাহ তা আলার বিশেষ অনুগ্রহে এই যে, যখনই উম্মাহর নের্তৃস্থানীয়রা অধঃপতিত হতো, দ্রুতই প্রতিস্থাপনকারীদের আবির্ভাব হতো এবং তারা মানুষের মুক্তির পথের নের্তৃত্বগ্রহণ করতেন।

মহান আল্লাহ বলেন -

وَّ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَ لَا تَضُرُّوۡهُ شَيۡـًٔا ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ

"এবং অন্য জাতিকে তোমাদের পরিবর্তে নিয়ে আসবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

তাই এ সভ্যতার ইতিহাসে একের পর এক নতুন ইসলামী জাতি বা নেতার উত্থান ঘটেছে। যারা ইসলামী সভ্যতার নের্তৃত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখি, উমাইয়াদের পতনের পর আব্বাসিদের উত্থান। একইভাবে বিলাসিতা আর স্থবির চিন্তায় নিমজ্জিত হওয়ায় আব্বাসিদের প্রতিস্থাপন মামলুক, সেলজুক বা উসমানিদের দ্বারা। প্রতিস্থাপন মহান আল্লাহর সুন্নাহ, আর তাজদীদ তথা পুনঃজাগরণ এই উম্মাহর বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে স্থবিরতা, অন্তর্কলহ, সামরিক-রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা। সাথে যুক্ত হয় পাশ্চাত্যের চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনার ব্যাপারে উদাসীনতা। ফলে, পশ্চিমা শক্তিগুলোর কাছে একের পর এক সামরিক পরাজয়ের মুখোমুখি হয় মুসলিম উম্মাহ। সেই সাথে চলতে থাকে বাণিজ্যের অজুহাতে ক্রমেই মুসলিম বিশ্বের ওপর পশ্চিমাদের প্রভাব বিস্তার। এই বাস্তবতাগুলোর ব্যাপারে বেখবর মুসলিম শাসকদের পতন ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

নিজ ভূমিতে গিলোটিন, গণহত্যা আর মুক্তির ধোঁয়াশাপূর্ণ বয়ানের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় শাসনের (Cristendom) পতন ঘটায় ইউরোপীয়রা। অন্যদিকে মুসলিম ভূমিগুলোতে লিবারেলিজম নামক নয়া ধর্মের বীজবপণ করা হয় উপনিবেশ স্থাপনের পর- ব্যাপক হত্যা, লুটপাট, শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থাকা সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস এবং স্থানীয় দালালদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসনে ইসলামী চিন্তাবিদ, উলামা ও নের্তৃত্ব সম্মুখীন হয় ঘোর সংশয় আর হতবুদ্ধিকর এক অবস্থার। ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশটি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, বুঝে বা না বুঝে, ইউরোপের বস্তুবাদী-ভোগবাদী জীবনাদর্শকে গ্রহণ করে নেয়। কেউ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কেউ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, আবার কেউ কেউ সকল ক্ষেত্রেই।

তবে, মুসলিম বিশ্বে শাসনক্ষমতা আর আইনি কাঠামোর সেক্যুলারাইজেশন সম্ভব হলেও, মুসলিম সমাজের সেক্যুলারকরণের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়রা নিজ দেশের মতো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যাক্তি ও সমাজজীবন থেকে ইসলামকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। কেননা, ইউরোপীয়দের অতীত হচ্ছে জনগণের উপর ক্যাথলিক চার্চের অত্যাচারের অতীত। তাদের ইতিহাস হচ্ছে ধর্মের নামে শোষণের ইতিহাস। বিপরীতে মুসলিম ভূমিসমূহের অতীত হচ্ছে ইসলামী ইনসাফ ও আত্মিক উৎকর্ষতার।

তবে, পশ্চিমের মতো সামগ্রিক না হলেও, ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের 'কল্যাণে' উম্মাহর চিন্তায় ও দেহে মারাত্মক কিছু ক্ষত তৈরি হয়ে গেল। পশ্চিমাদের মিডিয়া, একাডেমিয়া ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীদের ভূমিকায় লিবারেলিজমের বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়লো সমাজে। সৈয়দ আহমদ খান, মুহাম্মাদ আবদুহ, জিন্নাহ, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদদের মতো গাদ্দারদের বদৌলতে বিভ্রান্তির বিষাক্ত বাতাস আক্রান্ত করলো মুসলিম উম্মাহর বড় একটি অংশকে। ফলে সময়ের সাথে

সাথে দেখা গেল, উম্মাহ ইসলামী নিজামের পরিবর্তে গণতন্ত্রকে, কুরআনের বদলে মানবরচিত সংবিধানকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করলো। শুরু হল আলেমদের বদলে সেকুলার বুদ্ধিজীবিদের, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শের বদলে রুশো, কান্ট বা কামাল পাশার মতো লোকদের চিন্তার অনুসরণ।

মূল সমস্যার স্বরূপ চিহ্নিত না হওয়া, শাখাগত ইস্যুতে মশগুল থাকা এবং ইখলাসের পূর্ণতা না থাকায়- সেই থেকে অন্তঃসারশূন্য ও ভঙ্গুর পশ্চিমা সেক্যুলার চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও শাসনের প্রভাব আজো বিদ্যমান।

(২)

গত দুই শতাব্দী ধরে মুসলিমদের প্রধাণতম শত্রু হচ্ছে 'আধুনিক' পশ্চিম এবং তাদের দেশীয় দালালরা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পশ্চিমে তৈরি আধুনিকতার এই জীবনদর্শন মুসলিম ভূমিগুলোতে কেন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে? আর এর সাথে মুসলিমদের পতনের সম্পর্কই বা কী? এতো জটিল ব্যাখ্যার প্রয়োজনই বা কী? রাজনৈতিক ও সামরিক ময়দানে পিছিয়ে থাকাই কি মুসলিমদের পতনের মূল কারণ নয়?

এ প্রশ্নের উত্তরের দিকে তাকানো যাক।

কোনো দেশ দখলের পর বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার পতন ঘটাতে পশ্চিমারা মূলত দুই ধরণের হাতিয়ার ব্যাবহার করা শুরু করে। ফরাসী দার্শনিক লুই আলথুসারের পরিভাষায় এ দুটি হল –

ক) আদর্শিক হাতিয়ার/ Ideological State Apparatuses (ISA),

খ) দমনমূলক হাতিয়ার/ Repressive State Apparatuses (RSA),

আদর্শিক হাতিয়ার হল মূলত লিবারালিজমর সাথে আকিদা। আধুনিক নানা মতবাদ ও দর্শন। এই আকিদাগুলোর সম্প্রসারণে কাজে লাগানো হয় শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন, মিডিয়া, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল ইত্যাদিকে। অন্যদিকে দমনমূলক হাতিয়ার হল রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের কাঠামো। পুলিশ, কোর্ট, সামরিক বাহিনী, নির্বাহী বিভাগ ইত্যাদি। জালেম শাসনব্যবস্থা জনগণকে নিয়ন্ত্রন এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে আদর্শিক এই হাতিয়ারগুলোর চৌকস ইস্তেমাল আর দমনমূলক হাতিয়ারের নিয়মিত ব্যাবহারের মাধ্যমে। চিন্তার জগতে এক মুহুর্তের জন্য ফ্ল্যাশব্যাক করে দেখা যাক:

এর আগে ক্রুসেডার বা তাতারদের সামরিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন ইসলামী জাতি দেখেছে। শ দুয়েক বছর আগের ব্রিটিশ বা ফ্রেঞ্চদের সামরিক আগ্রাসনের তুলনায় তাতারী বা ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তি ও আগ্রাসনের মাত্রা ছিল বহুগুণ বেশী। তবুও তাদের প্রভাব ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ কিংবা আমেরিকানদের মতো এতটা দীর্ঘমেয়াদী ছিল না। কেন?

এর কারণ হল, তাতার বা ক্রুসেডাররা সামরিকভাবে বিজয়ী হলেও মুসলিমদের নেতা, আলেম বা সমাজের কেউই তাদের আদর্শ ও

আকীদাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত হয়নি। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে শুরু করে হাল জামানার ইসলামপন্থীরা পর্যন্ত- উম্মাহর বড় একটি অংশ পশ্চিমাদের আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। শুধু তাই না এই বর্বর আদর্শের তল্পিবাহক হতে জামানার মুসলিমদের অধিকাংশই রীতিমতো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত!

নিজ ভূমি থেকে খ্রিস্টীয় শাসনকে উপড়ে ফেলা পশ্চিমারা, মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে প্রবেশ করে দ্রুততার সাথে নিজেদের আদর্শিক হাতিয়ারগুলো (ISA) সক্রিয় করে তোলে। বহু বিদ্রোহ-বিপ্লব সফলতার সাথে দমনে তারা সক্ষম হয়। সেই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, তাদের দমনমূলক অস্ত্রের মোকাবিলা মোটামুটি হলেও, আদর্শিক অস্ত্রের বিপরীতে তেমন কোনো প্রস্তুতিই উম্মাহর মধ্যে তৈরি হয়নি। বরং, অন্য ধর্মাবলম্বীদের দেখাদেখি মুসলিম আলেম, নেতা, চিন্তাবিদ ও সাধারণ জনতা লিবারেলিজম তথা সেক্যুলারিজমের চাকচিক্যের চোরাবালিতে ঝাকে ঝাকে আটকে গেছেন! তাই তো, মুসলিম ভূখন্ডগুলো ছেড়ে যাবার সময়ও পশ্চিমারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মাঝেই আদর্শিক দালাল খুজে পেয়ে যায়!! দিন শেষে, পরমতসহিষ্ণুতার চাদর গায়ে দিয়ে "ক্ষমতার হস্তান্তর" এর নামে উপনিবেশবাদীরা স্বাধীনতার মোড়কে ছদ্মবেশী পরাধীনতা ধরিয়ে দিয়ে গেছে তাদের দেশীয় দালালদের হাতে।

অঢেল রক্তপাত, অজস্র অর্থব্যয় আর অফুরান আত্মত্যাগ সত্ত্বেও ইসলামপন্থীরা ইসলামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা থেকে আজো বহুদূরে। আরও সহজভাবে বললে- মুসলিম বিশ্বে, বিশেষ করে উপমহাদেশে সেক্যুলার শাসনের অধীনে ইসলাম ও মুসলিমদের সামগ্রিক অবস্থার ক্রমশ কেবল অবনতিই হচ্ছে! আর এই দুঃসহ প্রেক্ষাপটের মূল কারণ হল পশ্চিমা আধুনিকতার আদর্শিক সন্তানদের চিনতে না পারা। শুরুতেই আদর্শিক পরাজয় মেনে নিলে, সামরিক-রাজনৈতিক প্রস্তুতির বাস্তব ফলাফল আশা করা আসলে "উইশফুল থিংকিং" ছাড়া আর কিছুই না।

কারণ, বিগত দুই শতাব্দী ধরে থেকে ইসলামের বিপরীতে সবচেয়ে সক্রিয়, আগ্রাসী ও ব্যাপক জীবনব্যাবস্থা ও আকীদা হল লিবারেলিজম। যা সেক্যুলারিজম হিসেবেও সাধারণভাবে আমরা বুঝে থাকি। এই চিন্তাকাঠামো সরাসরি তাওহিদের আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক। আর ক্রমেই এই সংঘাত আরো তীব্র হচ্ছে।

ইসলাম বলে: "ব্যাক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ বা রাস্ট্র- সকল কিছুর উপর থাকবে ইসলামী শরিয়াহর কর্তৃত্ব।"

লিবারেলিজম বলে:"ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ বা রাস্ট্র- সকল কিছুর উপর থাকবে লিবারেল বুদ্ধিজীবি ও নেতাদের প্রণীত মানবরচিত আইন।"

লিবারেল চিন্তাকাঠামোকে গ্রহণ করে নেয়া মূলত তাওহিদের আকিদা প্রত্যাখ্যান করে শিরকে লিপ্ত হওয়ারই নামান্তর! পশ্চিমা 'লিবারালিজম'র বীষে লীন হয়ে উপমহাদেশের, বিশেষত বাংলাদেশের মুসলিমরা আজ এক মর্মন্তুদ প্রেক্ষাপটের মুখোমুখি। যেখানে অধিকাংশ মুসলিম দাবীদারের,

ব্যাক্তি ও সমাজজীবনে ইবাদতের মাধ্যমে তাকওয়া ও ইতমিনান অর্জনের মাধ্যমে আত্মিক মুক্তির আকিদার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে "ভোগবাদ" (Utilitarianism)।

অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে সোশালিজম ও পুজিবাদ।

রাজনৈতিক জীবনে শরীয়াহর শাসনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে সেক্যুলারিজম।

ঐক্য, আনুগত্য ও শত্রু-মিত্র নির্ণয়ের আকিদা "আল ওয়ালা ওয়াল বা'রা" আর নেই! সেখানে জায়গা করে নিয়েছে জাতীয়তাবাদ (Nationalism)।

প্রশাসনিক বিষয় ও নেতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমানতদার, পরহেজগারদের মাশোয়ারার পরিবর্তে চর্চিত হচ্ছে নির্বাচন ও গণতন্ত্র!

ব্যাক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামের শিক্ষার অবস্থান দখল করা এই মতবাদগুলোর প্রত্যেকটিই 'লিবারালিজম' নামক সামগ্রিক ব্যবস্থার একেকটি উপাদান। আরো বোধগম্য করলে বললে, এগুলো হলো "লিবারালিজমের বুনিয়াদ বা রুকনসমূহ"।

আর প্রতিটি দর্শনই স্বতন্ত্রভাবে "তাওহীদ" এবং ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক।

***

পরিশেষে...

পশ্চিমা ধাচের "আধুনিক" রাষ্ট্রের আদর্শিক হাতিয়ার হল লিবারেলিজম/সেক্যুলারিজম এবং এর থেকে উদগত বিভিন্ন মতবাদ। এই নব্য শিরকের ব্যাপারে অজ্ঞ ও গাফেল, তাওহিদের আকিদার সাথে আপস করা, আদর্শিকভাবে পক্ষাগাতগ্রস্ত কোনো গোষ্ঠীর পক্ষে উম্মাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক বা রাজনৈতিক ময়দানে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। আদর্শিক সংঘাত আর নিছক রাজনৈতিক সংঘাত কখনই এক নয়। তাওহিদের আকিদা পরিত্যাগ করে ইসলামের নের্তৃত্ব দেয়ার চিন্তা 'মরুভূমিতে নৌকা চালানোর' নামান্তর। এ বাস্তবতা উপলব্ধি ও চিহ্নিত করা এবং যথাযথ ও আন্তরিক মেহনত ছাড়া ইসলামপন্থীদের জন্য কার্যকর ফলাফল অর্জন অসম্ভবই বলা চলে!

ধারাবাহিকতার সাথে "আদর্শিক দেউলিয়াত্বের" আরো গভীরে প্রবেশ করতে থাকা জাতির পক্ষে সামাজিক শক্তি অর্জন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপারই বটে। আর সামাজিক শক্তি অর্জন ব্যাতীত রাজনৈতিক বা সামরিক ময়দানে প্রভাব বিস্তার অসম্ভব। আর নূন্যতম রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া কর্তৃত্বের অর্জনের পথ দুর্গমই রয়ে যায়!

তাই সামগ্রিক বাস্তবতা ও শরঈ দায়বদ্ধতার আলোকে আমাদের সবাইকেই ভাবতে, বুঝতে ও করণীয় ঠিক করতে হবে।